পৌরানিক অতিকথন বনাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

অনন্ত

ইমেইলঃ ananta_atheist@yahoo.com

ভূমিকাঃ আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় নানা কারণে অনেক বিশ্বাস- অপবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, জড়তাবোধ আর বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে অপজ্ঞান এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তা কোনোভাবেই তুলে ফেলা যাচ্ছে না। হাজার বছর ধরে অযৌক্তিক চর্চার ফলে এই সকল অপজ্ঞানের শিকড় আমাদের মতো সাধারণ মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে মিশে গেছে, রক্তের হিমোগ্লবিনের মতো আমাদের শরীরে অবস্থান করছে। যা আমাদেরকে অষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। প্রতিমুহূর্তে পিছনে টেনে ধরছে। আমার এই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি যদি এই সকল অপজ্ঞান আর অপবিশ্বাসের সামান্যতম ভিত নাড়িয়ে দিতে পারে তবে আমার শ্রম স্বার্থক বলে বিবেচিত হবে। ধন্যবাদ।

প্রথম পর্ব

রাম জন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ সমস্যা

ভারতীয় দুই কালজয়ী মহাকাব্য হচ্ছে রামায়ণ এবং মহাভারত। যুগ যুগ ধরে অগণিত হিন্দু ধর্মালম্বীদের কাছে এই মহাকাব্যদুটি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। মহাকাব্য রামায়ণে বিধৃত পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, সীতার দুঃখময় জীবন, রামভক্তি, হনুমানের বীরত্ব, রাবণ ও মেঘনাদের বীরত্ব, রাবনের অহংকারী মনোভাব, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, বিভীষনের ভূমিকা, বালী বধ ও শম্বুক বধ ইত্যাদি ঘটনা আজ ভারতীয় প্রচার মাধ্যম দূরদর্শনের কল্যানে হিন্দু ধর্মালম্বীদের মুখে মুখে। ১৯৮৮-৯০ সালে ভারতের দূরদর্শনে প্রথমে রামায়ণ এবং পরে মহাভারত ধারাবাহিক ভাবে দেখানো হয়, ১৯৯০ সালে আবার রাত্রের প্রোগ্রামে 'উত্তর রামায়ণ' সম্প্রচার করা হয়। এই দুই সিরিয়ালে বাল্মীকি এবং বেদব্যাসের দুই মহাকাব্যকে অনেক বিকৃত করে ধর্মীয় অবতার কাহিনীর রূপ দেয়া হয়েছিলো। যার ফলশ্রুতিতে অশিক্ষা আর কুসংস্কারে নিমজ্জিত ভারতবর্ষে তৈরী হয় এক ধর্মীয় উন্মাদনা আর সাথে সাথে মৌলবাদী রাজনীতিও নতুনভাবে উদ্ধত বটবৃক্ষের মতো মাথা তুলে দাঁড়ায়। এর ফল আমরা দেখতে পাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক স্বংঘ , শিবসেনা এবং অপারাপর মৌলবাদীদের তান্ডবে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর পাচঁশতাধিক বছরের পুরোন ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর গণহত্যার মধ্যে দিয়ে। এই সাম্প্রদায়িক তান্ডবের গরম হাওয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও এসে পৌছলো(এমনকি আমার মতো একজন মফস্বল শহরের সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকেও ছোঁয়ে গেলো)। নিগৃহিত, নিপীড়িত হলো এখানকার সাধারণ সংখ্যালঘুরা। সেই সময় সরকারী তথ্য মতে ভারতে প্রায় হাজার দুয়েক লোক মারা গিয়েছিলো (বেসরকারী হিসেব মতো তা আরো অনেক বেশী) এবং যাদের বেশির ভাগই ছিলো সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী। এই রাম জন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ সমস্যা কে পুঁজি করে ধর্মীয় জিগির তুলে কেন্দ্রের ক্ষমতায় এলো মৌলবাদী বিজেপি। এরপর ছলে বলে কৌশলে মঞ্চস্থ করা হলো আরেকটি গণহত্যা (২০০২ সালে)। একই কারণ রাম জন্মভূমি আর বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে। সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগানোকে কেন্দ্র করে ভারতের গুজরাট রাজ্যে নরেন্দ্রমুদি প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে শুরু হলো গণহত্যা। কি নৃশংস আর ভয়াবহ! সারা পৃথিবী অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো ঠাকুরমারঝুলির গল্প কেন্দ্র করে ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার ভারতবর্ষে সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী কিভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে দলিত, মথিত করলো। গণহত্যা, গণধর্ষন, লুটপাট কিছুই বাদ

যায় নি। নিরাপরাধ লোকদের জীবনত পুঁড়িয়ে ফেলা হলো, তলোয়ার দিয়ে পেট কেটে ফেলা হলো, গণধর্ষন চললো পানি খাওয়ার মতো। কি বিভৎস! এই গণ হত্যাকান্ডের সঠিক পরিসংখ্যান আজও জানা যায় নি। আদৌ জানা যাবে কি না সন্দেহ?

যেই রাম, রামায়ন, রাম জন্মভুমি অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে এতো নির্যাতন, নিপীড়ন, আর রক্তের হোলিখেলা চলছে দীর্ঘকাল ধরে এই উপমহাদেশে সেই রাম, রামায়ণ, রামজন্মভুমি অযোধ্যার কি কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে? আদৌ কি 'রাম' নামে বিষ্ণুর অবতার হয়ে জন্মেছিলেন ভারতবর্ষে বা কোনো রাজা ছিলেন কিংবা আদৌ কি রাম রাজত্ব্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ভারতবর্ষে? না কি স্রেফ গ্রীক মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' এর মতো মহাকাব্য এবং রাম, সীতা, লক্ষন, রাবণ সহ অন্যান্যরা কাল্পনিক চরিত্র? এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর খুঁজবো এই প্রবন্ধে।

রামায়ণের রচয়িতারা : ঋষি বাল্মীকি প্রচলিত রামায়ণের রচয়িতা বলে পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম রত্নাকর। একসময় পেশায় ডাকসাইটে দস্যু ছিলেন। জীবনে এক পর্যায়ে তিনি ঋষিতে উন্নীত হন। বিশ্বাস করা হয় তিনি নারদের কাছ থেকে রামের বৃত্তান্ত শুনেন এবং পরবর্তীতে ব্রক্ষার নির্দেশে সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। বাংলাভাষীদের কাছে কৃত্তিবাস ওঝার বাংলা রামায়ণ বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু অনুবাদের সময় তিনি বেশ কিছু সংযোজন করেন। যেমন : রামের দুর্গোৎসবের প্রসঙ্গ। এটি মূল বাল্মীকি রামায়ণে নেই। এদিকে তুলসীদাসের রামচরিতমানসের (বাংলা রামায়ণ) সঙ্গে বান্মীকি রামায়ণের বেশ অমিল রয়েছে। এ সুত্রেই উঠে বাংলা রামায়ণে যদি এমন সংযোজন হয়ে থাকে তাহলে বাল্মীকির নামে চালু রামায়ণে যে এমন ঘটনা ঘটে নি, তার নিশ্চয়তা কি? বিশেষ করে যখন এ মহাকাব্যটি কয়েকশ বছর ধরে রচিত হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণ রচিত হয়েছে যেমন বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়া রয়েছে দশরথ জাতক রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, উত্তর ভারতীয় রামায়ণ, দক্ষিণ ভারতীয় রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট্য রামায়ণ, ভূষন্ডি রামায়ণ, রামচরিত মানস বা তুলসী রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি। এসবের একেকটিতে এক এক ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে রামায়ণের কাহিনী (নিম্নে কয়েকধরনের রামায়ণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে)।

রামায়ণ রচনার সময়কাল : বর্তমানে প্রচলিত রামায়ণ (১) বালকান্ড, (২) অযোধ্যাকান্ড, (৩)অরন্যকান্ড, (৪)কিস্কিন্ধ্যাকান্ড, (৫)সুন্দরকান্ড, (৬)লঙ্কাকান্ড (যুদ্ধকান্ড) এবং (৭) উত্তরকান্ড নামে সাতটি কান্ডে বিভক্ত। তবে অধিকাংশ রামায়ণ বিশেষজ্ঞের মতে আদি বাল্মীকি রামায়ণ পাঁচ কান্ডে (অযোধ্যাকান্ড থেকে লঙ্কাকান্ড বা যুদ্ধকান্ড পর্যন্ত) সম্পূর্ণ ছিলো। এবং বাল্মীকি রামায়ণে রামকে একজন যুদ্ধবিশারদ রাজা হিসেবে চিত্রিত করা করা হয়েছিলো। সমগ্র বালকান্ড ও উত্তরকান্ড অনেক পরবর্তী কালে সংযোজন করা হয়েছিলো। রামায়ণ রচনার কয়েকটি ধাপ রয়েছে। প্রথম পর্যায় ছিলো খ্রিষ্টপুর্ব পঞ্চম শতাব্দী ও খ্রিষ্টীপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী। এসময়ে রামায়ণ এর পরম্পরা ছিলো মৌখিক অর্থাৎ অলিখিত। এই প্রাথমিক পর্যায়ে সূত (পাঠক) কিংবা কুশীলবেরা (চারণকবি) রামায়ণ গান করে বেড়াতো। ধারণা করা হয়ে থাকে এই কুশীলবদের থেকেই রামায়ণ-গায়ক হিসেবে রামের দুই পুত্র লব ও কুশের কল্পনা করা হয়েছিলো। এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ প্রায় দুশো বছর ধরে প্রচলিত ছিলো শুধুমাত্র অযোধ্যাকান্ড থেকে যুদ্ধকান্ড পর্যন্ত পাঁচকান্ডের অধিকাংশ ভাগ। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিসর ছিলো খ্রিষ্টপুর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চারশো বছর। এ সময়ে প্রথম দুশো বছরের মৌখিক পরম্পরায় যে পাঁচ কান্ড রচিত হয়েছিলো তা লিখে ফেলা হয়, আর লিখবার সময় এই পাঁচ কান্ডের মূল কাহিনীতে বেশ কিছু যোগ করা হয়। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী, প্রায় তিনশো বছরে ছিলো তৃতীয় পর্যায়। আর এই পর্যায়েই বালকান্ড এবং উত্তরকান্ড সংযোজিত হয়। এভাবে প্রায় সাত-আটশো বছরের পরিসরে বাল্মীকি-রামায়ণ নামে পরিচিত মহাকাব্যটি বহুলেখকের চেষ্টায় রচিত হয়েছিলো কিন্তু পরবর্তীতে তা বাল্মীকির নামে চালিয়ে দেয়া হয়। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পরও বাল্মীকি-রামায়ণে কিছু পরিবর্তন করা হয়। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ এ এল বেশমের মতে গুপ্তযুগে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে রামের অবতারতত্ত্ব বালকান্ড

ও উত্তরকান্ড রামায়ণে সংযোজিত হয়। আর এই কথা সত্য যে মধ্যযুগে তুর্কী-আফগান বহিরাক্রমনের পরেই রাম অবতার রূপে জনমনে স্বীকৃতি লাভ করেন।

ধারণা করা হয় তৎকালীন ইসলাম ধর্মের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে মধ্যযুগে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে ভক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিলো, রামকে অবতার রূপে প্রচার এবং জনমনে অধিষ্ঠিত করতে তার অবদান অনস্বীকার্য। রামকে বিষ্ণুর অবতারের আসনে স্থাপিত করে বিকৃত রামায়ণ কাহিনী প্রচারে খ্রিষ্টীয় পনেরো শতকে রচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও খ্রিষ্টীয় ষোল শতকে রচিত তুলসী রামায়ণ-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। এই সময় থেকে উত্তর ভারতের জনগণের এক বড় অংশ অবতার কাহিনী রূপে তুলসী রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এর বিকৃত অবতার কাহিনীকে আত্মস্থ করে। কিন্তু বালকান্ড ও উত্তরকান্ড সহ পল্লবিত বাল্মীকি রামায়ণে রামের অলৌকিকত্ব বর্তমান ছিলো, কিন্তু মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনের আগে অর্থাৎ কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং তুলসী রামায়ণ রচনার আগ পর্যন্ত অবতার হিসেবে রামের অথবা ধর্মগ্রন্থ রূপে রামায়ণের কোনো ব্যাপক স্বীকৃতি ছিলো না। আর বালকান্ড ও উত্তরকান্ড বর্জিত আদি বাল্মীকি রামায়ণে রামের অলৌকিকত্ব বা অবতারবাদের কোনো চিহ্ন ছিলো না। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মুসলমান সুলতানি শাসকদের আমলে অযোধ্যা অঞ্চলে পর্যন্ত রামপুঁজার প্রচলন ছিলো না। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দিভাষায় রামকাহিনী (অবতারতত্ত্ব সহ পল্লবিত আকারে) তুলসীদাস কর্তৃক লিখিত হওয়ার পরই অযোধ্যাতে রামকথা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে হিন্দু মঠ মন্দির রামের নামে নির্মিত হতে থাকে।

রামায়ণের আকার : আদি বাল্মীকি রামায়ণে পাঁচ কান্ডে (অযোধ্যাকান্ড থেকে যুদ্ধকান্ড পর্যন্ত) ২৪০০০ শ্লোক ছিলো। বর্তমানে সপ্তকান্ড বিন্যাস করা রামায়ণে ৪০,০০০ এর বেশি শ্লোক আছে।

রামায়ণের চরিত্রগুলির পরিচয় : বর্তমানে প্রচলিত রামায়ণ পাঠ ও তা বোঝার জন্যে এর বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা দরকার। এই লক্ষে রামায়ণের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে উল্লেখ করা হলো-

(১) **ইক্ষাকু** : রামের পূর্বপুরুষ। অযোধ্যার রাজা। ইক্ষাকু বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বৈব-স্বত মনুর ছেলে। মনুর 'কুৎ' অথবা 'হাঁচি' থেকে এর জন্ম বলে তাঁর নাম 'ইক্ষাকু'।

(২) **উর্মিলা** : লক্ষণের স্ত্রী। জনকের নিজের মেয়ে এবং সীতার বোন।

(৩) **কুম্ভকর্ণ** : রাবণের মেঝ ভাই।

(৪) **কৈকয়ী** : ভরতের মা। দশরথের দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া স্ত্রী। কেকয়রাজ অশ্বপতির মেয়ে, তাই তাঁর নাম কৈকয়ী।

(৫) **জনক** : মিথিলার রাজা। প্রকৃত নাম 'সীরধ্বজ'। 'জনক' একটি উপাধি। সীতার পালক পিতা।

(৬) **দশরথ** : রামের পিতা এবং অযোধ্যার রাজা। অজ ও ইন্দুমতীর পুত্র। রঘু বংশের আদি পুরুষ রঘুর নাতি। এঁর তিন স্ত্রী : কৌশল্যা, কৈকয়ী ও সুমিত্রা। এ ছাড়া আরও ৩৫০ উপপত্নি ছিলো দশরথের।

(৭) **নারদ** : বিখ্যাত দেবর্ষি।ব্রহ্মার মানসপুত্র। ভাগবত মতে এক দাসীর গর্ভে জন্ম হয় নারদের। রামায়ণের রচনার মূলে নারদ। তিনি প্রথম ঋষি বাল্মীকিকে রামের কথা শোনান।

(৮) **বালী :** বানর রাজা। সুগ্রীবের দাদা।

(৯) **বাল্মীকি :** আদি কবি। বলা হয়ে থাকে রামায়নের রচিয়তা। প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন। নাম ছিলো রত্নাকর। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত। দস্যুবৃত্তি দ্বারা সংসার চালাতেন, কিন্তু পাপের বোঝা তাঁর বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা কেউ বহন করতে রাজি না হওয়ায় তিনি দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করেন।

(১০) **বিভীষণ :** রাবনের ছোট ভাই। রাম-রাবনের যুদ্ধের সময় রামের পক্ষে চলে আসেন।

(১১) **বিশ্বামিত্র :** ব্রক্ষর্ষি নামে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে ছিলেন ক্ষত্রিয় কিন্তু কঠোর তপস্যা দ্বারা তিনি ব্রাক্ষণ্যত্ব লাভ করেন।

(১২) **ভরত :** ভগবান বিষ্ণুর অংশ-অবতার। তিনি বিষ্ণুর চারভাগের একভাগ পান। দশরথ ও কৈকয়ীর পুত্র। রামের একদিনের ছোট ভাই। লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের একদিনের বড়। জনকের ভাই কুশধ্বজের মেয়ে মাণ্ডবীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

(১৩) **মেঘনাদ :** রাবণ ও মন্দোদরীর বীর পুত্র।

(১৪) **রাম :** রামায়ণের নায়ক। বিষ্ণুর অবতার বলে কথিত। দশরতের বড় পুত্র। মাতা কৌশল্যা। মিথিলারা রাজা জনকের পালক কন্যা সীতার স্বামী। লব ও কুশ নামের যমজ সন্তানের পিতা।

(১৫) **রাবণ :** লঙ্কার রাজা। বিশ্রবা এবং নিকষার পুত্র। এক মতে ব্রক্ষার নাতির পুত্র। দশমাথা ছিলো বলে আরেক নাম দশানন। লঙ্কেশ বা লঙ্কেশ্বর ও বলা হয়ে থাকে।

(১৬) **লক্ষণ :** দশরথ ও সুমিত্রার দুই যমজ ছেলে লক্ষন ও শত্রুঘ্নের একজন। বিষ্ণুর অংশ-অবতার।

(১৭) **লব-কুশ :** রাম ও সীতার দুই যমজ সন্তান। এদের জন্ম বাল্মীকির আশ্রমে।

(১৮) **শত্রুঘ্ন :** দশরথ ও সুমিত্রা যমজ সন্তানের একজন। বিষ্ণুর অংশ অবতার।

(১৯) **সীতা :** জনকের পালিত কন্যা। রামের স্ত্রী ও লব-কুশের মা। রামায়ণের নায়িকা। জনকের মেয়ে বলে 'জানকী', মিথিলা রাজ্যের মেয়ে বলে 'মৈথিলা' বলে ডাকা হয়ে থাকে। সীতা মানে লাঙলের দাগ। ক্ষেতে লাঙলের ফলায় টানা 'সীতা'য় এঁকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন বলে জনক রাজা নাম রাখেন 'সীতা'।

(২০) **সুগ্রীব :** বানর রাজা। বালীর ছোট ভাই।

(২১) **সুমিত্রা :** দশরথের দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া স্ত্রী। মগধ রাজের মেয়ে। লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের মাতা।

প্রচলিত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত কাহিনী : রামায়ণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া আছে বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী'র ***রামায়ণ(আনন্দ পাবলিসার্স প্রা: লি: কলকাতা-১৯৯৮)*** গ্রন্থে। নিম্নে এটি উল্লেখ করা হলো -

(ক) **বালকান্ড :** অযোধ্যার ইক্ষাকু বংশীয় রাজা দশরথ এর তিন রানী। কৌশল্যা, কৈকয়ী আর

সুমিত্রা। কোনও ছেলে হয় নি। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন দশরথ। চার ছেলে হলো। কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকয়ীর গর্ভে ভরত, আর সুমিত্রার গর্ভে লক্ষন ও শত্রুঘ্ন।

রাক্ষস মারীচ আর সুবাহুকে বধ করার জন্য রামকে নিয়ে যেতে দশরতের রাজসভায় এলেন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র। অনিচ্ছাস্বত্ত্বেও, বৈশিষ্ঠের পরামর্শে সম্মতি দিলেন দশরথ। রাম-লক্ষন কে নিয়ে চললেন বিশ্বামিত্র। পথে ভয়ঙ্কর তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করলেন রাম। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যজ্ঞে বাধা দিতে এসে, রামের বাণে ধরাশায়ী হলেন সুবাহু। মরীচ গিয়ে পড়লেন একশো যোজন দূরের সমুদ্রে। মিথিলায় ঢুকেই, গৌতম মুনির আশ্রমে শাপগ্রস্থা পাষানী অহল্যাকে শাপমুক্ত করলেন রাম।

মিথিলার রাজা জনকের পালিত মেয়ে সীতা। জনক ঘোষনা করলেন, যে 'হরধনু'-তে শর জুড়তে পারবে, তার গলায় সীতা মালা দেবে। রাম ভাঙলেন সেই হরধনু। রামের গলায় মালা দিলেন সীতা। জনকের নিজের মেয়ে ঊর্মিলার সঙ্গে বিয়ে হলো লক্ষণের। জনকের ভাই কুশধ্বজের দুই মেয়ে মান্ডবী আর শ্রুতকীর্তি মালা দিলেন যথাক্রমে ভরত আর শত্রুঘ্নের গলায়। পরশুরামের দর্প ছিল, তাঁর 'বিষ্ণুধনু'তে কেউ জ্যা আরোপ করতে পারবে না। সে দর্প চূর্ণ করলেন রাম। সবাই মিলে ফিরে এলেন অযোধ্যায়। রাম অযোধ্যার সবার নয়নের মনি হয়ে উঠলেন।

(খ) <u>**অযোধ্যাকান্ড**</u> : দশরথের আদেশে, রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করার আয়োজন শুরু হলো। কুব্জা দাসী মন্থরা কৈকয়ীর মনকে বিষিয়ে দিল। দশরথের কাছে প্রাপ্য দুই বর চেয়ে নিলেন কৈকয়ী। এক বরে ভরতকে রাজা করতে হবে, দ্বিতীয় বরে রামকে চোদ্দো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হবে।

রাম, লক্ষন আর সীতা বনবাসে চলে গেলেন। ভরত আর শত্রুঘ্ন ছিলেন মামার বাড়িতে। ফিরে এসে, সব শুনে, রেগেই আগুন। চিত্রকুটে গিয়ে ভরত কেঁদে জড়িয়ে ধরলেন রামের দু'পা। রাম কিছুতেই ফিরতে রাজি হলেন না। অবশেষে রামের পাদুকা মাথায় নিয়ে এসে, অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়ে, রামের প্রতিনিধি হয়ে রাজকার্য দেখাশোনা করতে লাগলেন ভরত।

(গ) <u>**অরণ্যকান্ড**</u> : দন্ডকারণ্যে এলেন রাম, সীতা, লক্ষণ। রাক্ষস বিরাধকে বধ করলেন রাম আগস্ত্য মুনির পরামর্শে, চললেন পঞ্চবটীতে। পথে দশরথের বন্ধু জটায়ুর সঙ্গে পরিচয়।

লঙ্কার রাজা রাবণের বিধবা বোন শূর্পণখা সুন্দরী নারীর রূপ ধরে এসে প্রথমে রামকে এবং পরে লক্ষণকে বিয়ে করতে চাইলেন। শূর্পণখা'র নাক আর কান কেটে দিলেন লক্ষণ। প্রতিশোধ নিতে শূর্পাণখা ছুটলেন দাদা রাবণের কাছে। রাবণের আদেশে খর, ত্রিশিরা আর দূষন নামের রাক্ষস মহাবীর ছুটে এলেন পঞ্চবটিতে। তিনজনকেই যমালয়ে পাঠালেন রাম। রাক্ষস অকম্পের পরামর্শে, সীতাকে অপহরণ করার চক্রান্ত করলেন রাবণ। মারীচকে মায়ামৃগের রূপ ধারণ করে পঞ্চবটিতে ঘুরে বেড়ানোর আদেশ দিলেন রাবণ। রাবণের ফাঁদে কাজ হলো। 'সোনার হরিণ চাই'- বায়না ধরলেন সীতা।

রাম চললেন হরিণ ধরতে। মারীচ রামের রামের গলা নকল করে আর্তচিৎকার করলেন। রামের বিপদ আশঙ্কায় সীতা লক্ষণকে পাঠালেন রামকে ফেরাতে। সেই সুযোগে সন্নাসীর ভেক ধরে রাবণ এসে হরণ করলেন সীতাকে। লঙ্কায় নিয়ে চললেন। পুষ্পক রথে। পথে জটায়ুর সঙ্গে রাবণের ঘোরতর লড়াই হল। রাবণ জটায়ুর ডানা কেটে দিলেন। রাম-লক্ষণ সীতার খোঁজে বেরিয়ে জটায়ুর কাছে সব শুনলেন।
শুরু হলো পাগলের মতো সীতাকে খোঁজা। পথে কবন্ধকে বধ করলেন রাম। কবন্ধ দিলেন সুগ্রীবের খবর। পম্পা সরোবরের তীরে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে রামের প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলেন বৃদ্ধা তাপসী শবরী। তাঁকে দেখা দিলেন রাম। তারপর চললেন সুগ্রীবের খোঁজে।

(ঘ) **<u>কিস্কিন্ধ্যাকান্ড</u> :** বানররাজ সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব হলো রামের। সুগ্রীব কথা দিলেন, সীতাকে খুঁজে বার করবেন। রাম কথা দিলেন সুগ্রীবের দাদা বলি কে বধ করে, তাঁর কাছ থেকে রাজ্য আর সুগ্রীবের স্ত্রী রুমাকে আবার ফিরিয়ে দেবেন সুগ্রীবের কাছে। কথা রাখলেন রাম কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। লক্ষণের ভয়ে শুরু করলেন সীতা অন্বেষণ। জটায়ুর দাদা সম্পাতির কাছ থেকে সীতার সুলুক-সন্ধান পেলেন বালীর ছেলে অঙ্গদ। ঠিক হলো, হনুমান যাবেন লঙ্কায়।

(ঙ) **<u>সুন্দরকান্ড</u> :** মহেন্দ্র পর্বতের মাথা থেকে এক লাফ দিলেন হনুমান। এক লাফেই সাগর পার। এলেন লঙ্কায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর, সীতাকে দেখতে পেলেন অশোক বনে।
সীতাকে প্রনাম করে, রাম নাম লেখা রামের আংটি সীতার হাতে তুলে দিলেন হনুমান। সীতার আচঁল থেকে একটি গয়না বের করে দিলেন রামকে দেয়ার জন্যে। সীতাকে উদ্দারের নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে হনুমান ফিরে এলেন। সীতার খবর পেয়ে আশ্বস্ত হলেন রাম-লক্ষন, সাথে বানরেরাও আনন্দে হই চই শুরু করে দিলো।

(চ) **<u>লঙ্কাকান্ড (যুদ্ধকান্ড)</u> :** যুদ্ধযাত্রার তোড়জোড় শুরু করলেন রাম। এদিকে রাবণের ধর্মভীরু ভাই বিভীষণ সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করলেন কিন্তু পরবর্তীতে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়ে যোগ দিলেন রামের পক্ষে।

বানরের দল বড় বড় পাথরের চাঁই আর গাছ দিয়ে লঙ্কা পর্যন্ত সেতু তৈরী করে ফেললেন। শুরু হলো যুদ্ধ। একে একে রাবণের পক্ষের ইন্দ্রজিৎ, অতিকায়, মহোদর, কুম্ভকর্ণ সহ অনেকেই মারা পড়লো রাম-লক্ষণের হাতে। বিভীষণ নানা কৌশল বলে দিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করলেন রামকে। সবশেষে শুরু হলো রাম-রাবণ যুদ্ধ। অনেক চেষ্টার পর রাম ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে রাবণকে হত্যা করলেন।

বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করা হলো। সীতা রাবণের কাছে ছিলেন বলে, রাম লোকনিন্দার ভয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে চাইলেন না। আগুনে আত্মাহুতি দিতে চাইলেন সীতা। কিন্তু আগুন জ্বালতেই, অগ্নিদেব সীতাকে কোলে করে রামের কাছে ফিরিয়ে দিলেন, বললেন : ‘সীতা অপাপবিদ্ধা! শুদ্ধা! পবিত্রতাস্বরূপিনী!’

সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরলেন রাম আর লক্ষন চৌদ্দবছর পর। রাম রাজা হলেন। ভরত হলেন যুব রাজ।

(ছ) **<u>উত্তরকান্ড</u> :**সীতাকে নিয়ে প্রজারা কানা ঘোষা শুরু করে দিল। রাম লক্ষনকে আদেশ করলেন সীতাকে তমসা নদীর তীরে বাল্মীকি মুনীর আশ্রমে রেখে আসতে। বাল্মীকি আশ্রমে সীতার লব কুশ নামে দুটি যমজ সন্তান হলো।

অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন রাম। কৃত্তিবাসী রামায়ন মতে যজ্ঞের ঘোড়াটাকে আটকে রেখে একে একে হনুমানসহ, শত্রুঘ্ন, ভরত, লক্ষণ, রাম সকলকে পরাস্ত করলেন বালক লব, কুশ। বাল্মীকি মুনির মধ্যাস্থতায় সবাইকে মুক্তি দেয়া হলো। এ কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে নেই।

যজ্ঞক্ষেত্রে ঋষিবালকের বেশে লব-কুশ শোনালেন বাল্মীকি রামায়ণ। বাল্মীকি রামকে জানালেন লব-কুশ ও সীতার কথা। সীতাকে আবার শুদ্ধতার পরীক্ষার কথা বললেন রাম। ক্ষোভে, দুঃখে সীতা পাতাল চলে গেলেন।

কালপুরুষের কৌশলে, রামকে দুর্বাসা মুনির আগমন বার্তা দিতে গিয়ে, পূর্বশর্ত মতো লক্ষণকে

প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো সরযূ নদীতে। অনুতপ্ত রাম কুশকে কোশল আর লবকে উত্তর দেশের রাজা করে দিয়ে নিজে প্রাণ বিসর্জন দিলেন সরযূ নদীতে। ভরত, শত্রুঘ্ন ও রামের পথ অনুসরণ করলেন। (শেষ)

আরোও কিছু তথ্য : ডঃ আর এম দেবনাথ তাঁর ***সিন্ধু থেকে হিন্দু*** গ্রন্থে (***রিডার্স ওয়েজ, বাংলাবাজার ঢাকা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩১, ৩২***) উল্লেখ করেছেন-

(১) আদি বাল্মিকি রামায়ণ বলে পরিচিত রামায়ণে (অযোধ্যাকান্ড থেকে যুদ্ধকান্ড পর্যন্ত) রাম পরিচিত ছিলেন 'নরচন্দ্রমা' হিসেবে।

(২) রাম বেঁচে ছিলেন ৬৯বছর ১ মাস ১০ দিন (কিন্তু উত্তরকান্ডের ১০৪ নম্বর সর্গে কালরূপী ব্রহ্মার দূতের বর্ণনা থেকে জানতে পারি যে রাম এগারো হাজার বছর পৃথিবীতে বাস করিবার জন্য জন্ম গ্রহন করেন। এক্ষেত্রে কোনটি সত্য? না কি কোনটাই সত্য না?)। রাম বিয়ে করেছিলেন ১৩ বছর বয়সে, তখন সীতার বয়স ছিলো মাত্র ৬ বছর। রাম বনে গেছেন ২৫ বছর বয়সে। ১৪ বছর বনবাসের পর ফিরে এসে রাজা হয়েছেন ৩৯ বছর বয়সে। রাজত্ব করেছেন ৩০ বছর ১মাস ২০ দিন।

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তীর '***রামায়ণ***' গ্রন্থ থেকেও আর কিছু তথ্য জানা যায়। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

(৩) রাম-লক্ষণ-সীতা প্রমুখ রাজপরিবারের সকলেই মাংস খেতেন। রাজা হওয়ার পর প্রমোদ কাননে সীতাকে কোলে বসিয়ে রাম নিজের হাতে করে 'মেরয়' মদ পান করিয়েছিলেন। বানর রাজা বালির স্ত্রী 'তারা' মদ পান করতেন।

(৪) রাম-রাবণের যুদ্ধ চলে ১৭-১৮ দিন।

(৫) লক্ষণ কখনো সীতার মুখ দেখেন নি, দেখেছেন পা।

বালকান্ড ও উত্তরকান্ড নিয়ে সমস্যা : রামায়ণে রামের অলৌকিকত্ব, বিষ্ণুর অবতাররূপে রামকে চিহ্নিত করার প্রয়াস তা শুধু বালকান্ড এবং উত্তরকান্ড এর মধ্যেই রয়েছে। বাকি পাঁচকান্ডের সম্বনয়ে রামায়ণ অন্যান্য সাধারণ কাব্য, মহাকাব্য, গল্পগাঁথার মতোই রচিত। এবার উত্তরকান্ডের কথা বলা যাক। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে উত্তরকান্ডই বালকান্ডের আগে সংযোজিত হয়েছে। উত্তরকান্ডের সংযোজন যে মূল বাল্মীকি রামায়ণ (যা বহু লেখকের প্রচেষ্টায় রচিত, এবং ঋষি বাল্মীকির নামে প্রচলিত) রচনার কয়েকশো বছর পরে রচিত, তার প্রধান প্রমাণ এই কান্ডের ভাষা, রচনাশৈলী, যা অনেক পরবর্তী সময়ের সংস্কৃত ভাষা ও কাব্য রচনার পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত (দেখুন : ***A.L. Basham, The Wonder that was India, Forntana (in association with Rupa). Calcutta, 1971, PP. 301, 306***)। প্রাচীন মহাকাব্য কিংবা প্রচারধর্মী যে কোন কাব্য যেভাবে শেষ করা হতো, যুদ্ধকান্ড অর্থাৎ ষষ্ঠকান্ডের শেষে তার সব নিদর্শন রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ষষ্ঠকান্ডে রামরাজত্বের উৎকর্ষের বর্ণনা, রামায়ণ পাঠ ও শ্রবনের মাহাত্ম্য আর অনেকরকম ইহলৌকিক লাভের কথা বলা হয়েছে। উত্তরকান্ড বাদ দিয়ে যুদ্ধকান্ড পর্যন্ত রামায়ণ পড়লেই মনে হয় যেন কাহিনী শেষ হয়েছে (মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত রামোপাখ্যানও এখানেই শেষ)। কিন্তু উত্তরকান্ডের শুরুতে যেন হটাৎ করেই মুনি অগস্ত্য সহ কয়েকজন রাজপ্রাসাদে এলেন (উপরের সংক্ষিপ্ত রামায়ণ বর্ণনায় এই কাহিনী উল্লেখ করা হয় নি।) এবং নানারকমের গল্পের মাধ্যমে কর্মফল, সমাজতত্ত্ব, রামের অবতারতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণানা করতে লাগলেন। যা মহাকাব্যের বাকী অংশের সঙ্গে রচনাত্মক কোনো সংযোগ নেই। তাছাড়া বলা যায় যে, উত্তরকান্ডের লেখক (বহু বচন হবার সম্ভবনাই বেশী) নিজেই আশংকা করেছিলেন,

এই কান্ডের মৌলিকতা নিয়ে সন্দেহ জাগতে পারে। তাই তিনি শেষ সর্গে অকারণে বিশেষ করে লিখেছেন, উত্তরকান্ডসহ সমগ্র রামায়ণ-ই বাল্মীকি কতৃক রচিত এবং অকারনে রামায়ণের মহাত্ম্য গাইলেন কিন্তু রামরাজত্বের কোনো বর্ণনা নেই। তাই ভাষা ও রচনাশৈলী সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের মতামত যোগ করলে এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, রামের অবতারতত্ত্ব, সীতার বনবাস, দ্বিতীয়বারের অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন, পাতাল প্রবেশসহ সমগ্র উত্তকান্ড পরবর্তী যুগের দীর্ঘ সময়ে প্রক্ষিপ্ত সংযোজন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, উত্তরকান্ডের মতো সমগ্র বালকান্ডও প্রাথমিক পর্যায়ের রামায়ণ রচনার অন্তত দুতিনশো বছর পরের রচনা। এই সিদ্ধান্ত ও প্রধানত বিশেষজ্ঞদের এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, বালকান্ডের ভাষা, শব্দচয়ন, রচনাশৈলী তুলনাক্রমে আধুনিক যুগের সাক্ষ্য বহন করে। তারমধ্যে আবার যে অংশে রামের আপাত অলৌকিক জন্মকাহিনী লেখা আছে, তা তুলনাক্রমে আরও অনেক পরে সংযোজিত। কারণ বালকান্ডের আরম্ভে বর্ণিত নারদের কাহিনীতে এবং বাল্মীকি রচিত রামায়ণ-এর সংক্ষিপ্তসারে এতো বড় একটা ঘটনার উল্লেখমাত্র নেই। তাই বলা যায় যে, বাল্মীকি রচিত রামায়ণ বলে প্রচলিত রামায়ণ রচনা করা হয়েছিলো তৎকালীন সময়ে ভারতীয় মানসপটে প্রতিষ্ঠিত মিথ এর উপর ভিত্তি করে। সর্বভারতের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকগণ সে কথাই মনে করেন; কেননা বাল্মীকির রামায়ণ বা মহাভারত অনুসারে যে চারটি যুগের কথা (সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ, কলিযুগ) কল্পনা করা হয়, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। এছাড়া খোদ রামায়ণ (***বাল্মীকি রচিত ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুদিত রামায়ণ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ১৭***) থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বিশিষ্ট অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় তাঁর ***মহাকাব্য ও মৌলবাদ*** গ্রন্থে (***এলাইড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ২১***) ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : ‘‘ বাল্মীকি রামায়ণে-এর বালকান্ডে যেভাবে কাহিনীর অবতারনা করা হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে রাম নামক একজন নরপতির উপাখ্যানকে কেন্দ্র করেই এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে। কোনো অবতারের বাস্তব ইতিহাসকে নয়। রামায়ণের আরম্ভে বাল্মীকি নারদকে বলেছেন : ‘এক্ষনে এই পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি গুনবান, বিদ্বান, মহাবল, পরাক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন? কোন ব্যক্তি সকলপ্রকার প্রাণীর হিতসাধন করে থাকেন? কোন ব্যক্তি লোকব্যবহারকুশল, অদ্বিতীয়, সুচতুর ও প্রিয়দর্শন? কোন ব্যক্তিইবা রোষ ও অসুয়ার বসবর্তী নহেন? রণস্থলে জাতক্রোধ হইলে কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন? হে তপোবন! এইরূপ গুনসম্পন্ন মনুষ্য কে আছেন, তাহা আপনিই বিলক্ষন জানেন। এক্ষনে বলুন, ইহা শ্রবন করিতে আমার একান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।’ বাল্মীকি স্পষ্টতই একজন বহুগুনসম্পন্ন আদর্শ মানুষের পরিচয় পেতে চাইছেন। অবতারের কথা জিজ্ঞেস করছেন না। এমনকি কোন রাজার কথাও জিজ্ঞেস করছেন না। অবতারত্বের প্রশ্ন জড়িত থাকলে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হতো না। কারণ রামায়ণ-এর অন্যত্র বর্ণনা অনুযায়ী অযোধ্যা নগরী থেকে বাল্মীকির আশ্রম বেশী দূরে ছিলো না। বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরে নারদও একজন বহুগুন সম্পন্ন নরপতির নাম করেছেন, একজন অবতারের নাম নয়। নারদ বলেছেন : ‘তাপস, তুমি যে সমস্ত গুনের কথা উল্লেখ করিলে, তৎসমুদয় সামান্য মনুষ্যে নিতান্ত সুলভ নহে। যাহাই হউক, এরূপ গুনবান মনুস্য এই পৃথিবীতে কে আছেন, এক্ষণে আমি তাহা স্মরণ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর।’ এর পর নারদ এই বলে কাহিনী শুরু করেছেন যে, ‘রাম নামে ইক্ষাকু বংশীয় সুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন।’ তারপর রামের কিছু গুন বর্ণনা করে তার অভিষেকের মুখে কৈকয়ীর ষড়যন্ত্র এবং দশরথের কাছে বর প্রার্থনা থেকে আরম্ভ করে সীতাকে উদ্ধার করে লংকা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কাহিনী সংক্ষেপে বলে শেষে জানাচ্ছেন যে তখনও ‘অযোধ্যাধিপতি রাম পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছেন।’ অর্থাৎ নারদ কাহিনী বাল্মীকিকে বলবার সময় রাম অযোধ্যায় রাজত্ব করছেন। এরপর নারদ রামরাজত্বের মহত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, ‘রাম দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্য শাষন করিয়া ব্রক্ষলোকে গমন করিবেন।’ এই অবতারণা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, নারদ নিজ স্মৃতি মন্থন করে বাল্মীকিকে একজন অসাধারণ রাজার কাহিনী বলেছেন, অবতারের কাহিনী নয়। দ্বিতীয়ত, এই অসামান্য রাজা সেই সময়ই বাল্মীকির আশ্রমের

অনতিদূরে অযোধ্যা নগরে রাজত্ব করেছেন। রামায়ণ-এর অন্যত্র রামরাজ্যের বিস্তৃতির পরিচয় থেকে জানতে পারি যে, এই বাল্মীকির আশ্রম শুধু যে রামরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো তাই নয়, রাজধানীর খুব কাছে ছিলো। অথচ রামের কাহিনী তো দূরের কথা, তার নামও মহর্ষি বাল্মীকি জানতেন না। ত্রিকালজ্ঞ এবং ত্রিভুবনে ঢেঁকি চড়ে অনায়াস বিচরণকারী কল্পচরিত্র দেবর্ষি নারদকেও এই নামটি বলবার সময় স্মৃতি মন্থন করতে হল। এ ধরনের অবতরণিকাই কি এই প্রাথমিক ইংগিত বহন করে না যে রামায়ণ-এর রচিয়তা এ কাহিনীকে বাস্তব ইতিহাস হিশেবে প্রচার করতে চান নি। এগারো হাজার বছরের রাজত্বের গল্পও কি পুরাণের অনেক গল্পের মতো শুধু মহাকাব্যিক কল্পনা নয়?'' এথেকে কি বোঝা যায় না, বাল্মীকির নামে প্রচলিত (যারাই লিখে থাকুন) রামায়ণটি স্রেফ মহাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ নয়, ইতিহাসও নয়।

রামের অবতারতত্ত্বের বিশ্লেষন : বাল্মীকি রামায়ণ বলে প্রচলিত রামায়ণ মহাকাব্যকে বাস্তব ইতিহাসে রূপান্তরিত করবার প্রবণতা ধর্মবিশ্বাসের ফলশ্রুতি। আর এই মহাকাব্য ধর্মবিশ্বাসের সংগে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে যাবার কারঞ রামের অবতারত্বের কাহিনী। এ প্রসংগে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিষ্ণুর অবতার হিসেবে রামের জন্মের তত্ত্ব মূলত রামায়ণ-এর বালকান্ড এবং উত্তরকান্ডেই সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে বালকান্ডের এক অংশে আপাত অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত থাকলেও সেখানে বিস্তারিত উপাস্থাপনা নেই। একমাত্র উত্তরকান্ডে এই তত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে স্থান পেয়েছে। বিশেষত, উত্তরকান্ডের ১০৪ নম্বর সর্গে কালরূপী ব্রহ্মার দূত এসে রামকে ব্রহ্মার হয়ে জানাচ্ছেন যে রামই স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং দেবতাদের রক্ষক (রাম বোধহয় নিজে জানতেন না!!)। ''প্রজাগণ রাবণের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, তুমি সেই দুর্বৃত্তকে বধ করিবার জন্য মনুষ্যরূপ ধারণে অংগীকার কর এবং একাদশসহস্র বৎসর পৃথিবীতে বাস করিবার নিয়ম করিয়া রাজা দশরথের পুতৃরূপে অবতীর্ণ হও। এক্ষণে তোমার আয়ুস্কাল পূর্ণ হইয়াছে। এই জন্যই আমি সর্বসংহারক কালকে তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম।'' কাল আরও বললেন, 'যেহেতু রাম সর্বলোকের অধীশ্বর, তিনি ইচ্ছে করলে, পৃথিবীতে আরও যতকাল ইচ্ছে থেকে যেতে পারেন।' কিন্তু রাম ব্রহ্মার বাক্যে প্রীত হয়ে বললেন, 'আমি যে স্থান হইতে আসিয়াছি তথায় গমন করিব, সন্দেহ নাই।'' তারপর তিনি স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে সরযূনদীর তীরে উপস্থিত হলে অন্তরীক্ষ থেকে ব্রহ্মা বললেন, ''বিষ্ণো! স্বর্গে আগমন কর। .... তুমিই লোকের গতি, তুমিই অচিন্ত্যবস্তু পরিচ্ছেদ ও কালপরিচ্ছেদের অনায়ত্ত এবং অজয় ও অমর ''(তথ্য সুত্র: ***বাল্মীকি রচিত ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুদিত রামায়ণ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ১০৯৭,১০৯৮,১১০৩***)। তারপর রাম ''সশরীরে বৈষ্ণবতেজে'' স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাম যদি বিষ্ণুর অবতার হয়ে থাকেন, তবে বিষ্ণু কে?

প্রাচীন কালে স্বভাবতই বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব ছিল। মানুষ তখন বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ভয়ে, বিস্ময়ে অভিভুত হয়ে পড়ত এবং তাদেরকে দৈবশক্তি, আধিভৌতিক, অলৌকিক সত্তা হিসেব কল্পনা করত। এভাবে আকাশে সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঝড়, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতিকে দেবদেবী রূপে কল্পনা করতো তেমনি পৃথিবীতে অগ্নি, জল, মাটি, পর্বত, নদী, বন প্রভৃতি অনেক প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে দেবদেবীর অধিষ্ঠান কল্পনা করত। কিন্তু সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তাদের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর, শক্তিশালী এবং সর্বব্যাপী সত্তা ছিল সূর্য আর তার পরেই চন্দ্র। তাই সূর্যকে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য করিবার রীতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সভ্যতায় প্রচলিত ছিল। অন্যান্য গ্রহ বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি দৃশ্যত বড় বড় গ্রহকেও দেবতা জ্ঞান করা হত। সূর্যের সৃজনীশক্তি এবং প্রখরতার জন্য তাকে পুরুষ দেবতা এবং চন্দ্রের স্নিগ্ধতার জন্য তাকে সাধারণত দেবী হিসেবে কল্পনা করা হত। প্রাচীন মিশরে 'রা' নামে আর গ্রীসে 'এপোলো' নামে সূর্যকে শ্রেষ্ঠ দেবতা পুঁজো করা হত। ভারতবর্ষেও বৈদিকযুগ থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত সূর্যকেই সর্বপ্রধান দেবতা রূপে কল্পনা করা হত এবং বিভিন্ন মন্ত্রের মাধ্যমে অনেক নামে পুঁজা করা হত। তবে সব দেশেই স্থানীয় ভৌগলিক, আর্থসামাজিক পরিবেশ দেবতার রূপ কল্পনায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন, আমরা জানি প্রাচীনকালে মিশরে নীলনদই ছিল ব্যবসাবাণিজ্য এবং যাতায়াতের অন্যতম উপায়, তাই তারা

কল্পনা করত সূর্য আকাশ পথে নৌকায় চড়ে যাতায়াত করেন, আর অন্যান্য দেবতারা লৌকার মাঝি। আবার অন্যদিকে, ভারতবর্ষ সহ গ্রীসে অভিজাত শ্রেনী রথে চড়ে যাতায়াত করতেন, তাই এসব অঞ্চলে কল্পনা করা হয় সূর্য আকাশ পথে রথে চড়ে যাতায়াত করেন আর অন্যান্য দেবতারা রথের অশ্ব, সারথি ইত্যাদি। আবার প্রাচীন কাল এবং মধ্যযুগে রাজারা এবং তাদের অন্নে পালিত শাস্ত্রকারেরা সূর্য এবং চন্দ্র থেকে রাজাদের বংশের উৎপত্তি বলে প্রমান (!) করিবার চেষ্টা করিতেন। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, মিশরের ফারাও সম্রাটেরা নিজেদের বংশকে সূয থেকে উৎপত্তির দাবি করত। এছাড়া মহাভারতে কৌরব-পান্ডবদের চন্দ্র থেকে, কৃষ্ণ সহ যাদববংশ সূর্য থেকে এবং রামায়ণ-এ রঘুবংশকে সূর্য থেকে উৎপত্তি বলে দাবি করা হয়েছে। বিশেষত সূর্য থেকে উৎপন্ন বলে কল্পিত রঘুবংশের রাম যদুবংশের কৃষ্ণের উপরে কালক্রমে ক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক এবং ব্রাক্ষ্মণের সামাজিক প্রয়োজনে সূর্যত্ব অথবা বিষ্ণুত্ব আরোপ করা হয়েছে, আর এই উদ্দেশ্যে রামায়ণ-মহাভারত এর প্রাচীন লোকগাঁথাকে পল্লবিত করা হয়েছে।

'বিষ্ণু' শব্দের আক্ষরিক অর্থ (বিষ্ = বিস্তার+নু) যার বিস্তার বা ব্যাপ্তিই পরিচয়। বলাবাহুল্য, পৃথিবী থেকে আপাতদৃষ্টিতে দেখা আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে সূর্যের আছে একমাত্র এই পরিচয়। এখন খুব সংক্ষেপে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ (?) থেকে দেখা যাক যে, সূর্যই বিষ্ণু (আগ্রহীরা এ ব্যাপারে পড়ে দেখতে পারেন ***জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায়, মহাকাব্য ও মৌলবাদ, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ১২৯-১৪৫***)। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলের ২২ সূক্তের ১৬-১৭ঋকে একই সংগে অশ্বীদ্বয়, সবিতা এবং বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। নিরুক্ত টীকাকার দুর্গাচার্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন : ''বিষ্ণুরাদিত্যঃ ।....সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেহন্তরীক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ মন্যতে।'' ভাবার্ত হচ্ছে সূর্যই বিষ্ণু, তার উদয়কালীন, মধ্যাহ্নকালীন আর অস্তকালীন এই তিন পাদবিক্ষেপ। বিশেষত মধ্যেদিনে অন্তরীক্ষে অবস্থিতিই সূর্যের বিষ্ণুত্ব। ঋগবেদ সংহিতার প্রথম মন্ডলের ১৫৫ সূক্তের ৫ঋকে বলা হয়েছে যে 'মানুষেরা বিষ্ণুর দুই পাদই অবলোকন করতে পারে এবং ধারণা করতে পারে। তৃতীয় পাদ মানুষেরা ধারণা করতে পারে না, এমনকি উড্ডীয়মান পক্ষীরাও প্রাপ্ত হইতে পারে না।' অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সূর্যকে নিরীক্ষণ করা মানুষের পক্ষে কঠিন এবং পাখীদের পক্ষেও তার কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব। একই সূক্তের পরবর্তী ৬ঋকে বলা হয়েছে যে 'বিষ্ণু চারটি নব্বই দিনকে চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করেন।' এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে বৈদিক যুগে প্রচলিত চার ঋতুর নিয়ন্তা হিসেবে সূর্যের কথা এখানে বলা হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে ঋগ্বেদের আরও অনেক সূক্তে (১/১৫৪/৪-৬, ১/১৫৫/৪, ১০/৩৭) বিষ্ণু এবং সূর্য উভয়কেই জ্যোতির উৎস, অন্ন উৎপাদক, জগতের রক্ষাকর্তা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সূর্য, বিষ্ণু, সবিতা একই দেবতা, অশ্বীদয় তাদের রথের ঘোড়া। আর ঊষা এবং রাত্রি এই দুই দেবী সূর্য অথবা বিষ্ণুর গতি দ্বারাই সৃষ্ট। সামবেদ সংহিতা-তেও অনেক জায়গায় সূর্যকেই বিষ্ণু বলা হয়েছে। যেমন সামবেদ সংহিতার ১৭/১/১/১৬২৫-২৬ এ বলা হয়েছে যে ''হে বিষ্ণু! এই যে তুমি বললে,'আমি বালরশ্মি সমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এই কি তোমার একমাত্র রূপ? তুমি সংগ্রামে (অর্থাৎ মধ্যদিনে) অন্যরূপ ধারণ করে থাক, আমাদের কাছে তোমার সেই অন্যরূপ প্রকাশিত কর।............সেই মহান আমি তোমাকে স্তব করছি। সামবেদ সংহিতার ১৮/২/৫/১৬৭০-৭৪ এ বলা হয়েছে ''বিষু এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমন করেন। এঁর পদ সুদৃঢ়রূপে অন্তরীক্ষে স্থাপিত।........ যখন বিষ্ণু পৃথিবীর সর্বত্র পরিক্রমা করেন, তখন রশ্মিরূপ দেবগণ আমাদের জন্য পৃথিবীতে প্রবেশ করেন।'' বিশিষ্ট সামবেদ বিশেষজ্ঞ পরিতোষ ঠাকুর (দেখুন :***সামবেদ সংহিতা, অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিতোষ ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৫, ভূমিকা***) দেখিয়েছেন যে সামবেদ-এ সূর্য ও বিষ্ণু এক ও অভিন্ন, ঋগ্বেদের মতো সামবেদ-এও অগ্নি, রুদ্র, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবদেবী সূর্যের বিভিন্ন শক্তি বিশেষ।

অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, সূর্যের আরেক নামই বিষ্ণু। বিষ্ণুর উপাসনা ছিল বৈদিক ধর্মের সূর্য উপাসনারই নামান্তর মাত্র। আজ আমরা জানি সূর্য একটি জড়পিন্ড। মহাকাশে সূর্যের চেয়ে

অনেকগুন বড় অগনিত নক্ষত্র রয়েছে। আর সূর্যের পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মানো অসম্ভব কল্পনা শুধু মাত্র নয়, ঠাকুরমার ঝুলির কেচ্ছা সম। আজ যারা(গোঁড়া হিন্দুরা) রাম, কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার ভেবে পুঁজা করেন, বিশ্বাস করেন, পাঁচশতাধিক বছরের পুরনো মসজিদ (আমাদের কাছে পুরাতত্ত্ব) ভেঙ্গে ফেলে নতুন রাম মন্দির তৈরির জন্য আন্দোলন করেন, সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প ছড়িয়ে দেন, তাদের কে কি বলা যায়? ধর্মান্ধতা আর ভ্রান্ত চেতনা শিকার মাত্র নাকি জেনে বুঝে এসব করছেন?

চলবে........